ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ▷

কৃষি ও কৃষকের দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

স্বঘোষিত দাতা-মুরব্বিদের তীব্র বিরোধিতার মুখেও কৃষি উপকরণে ভর্তুকির ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে যথাস্থানে ভর্তুকি মূল্যে যথাসময়ে সারসহ অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে কৃষি খাতে যে রেকর্ড পরিমাণ প্রবৃদ্ধির সূচনা করেছে শেখ হাসিনার সরকার, তাতে আশান্বিত হওয়ার কারণ রয়েছে বৈকি। তবে আমলাতান্ত্রিক ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে যেন ইতিমধ্যে অর্জিত সুফল নষ্ট না হয়ে যায় ও বিশেষ করে মূল্যসমর্থননীতি যেন শক্তিশালী ও সময়োপযোগী হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও এর সামাজিক রূপান্তর আজ বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। কিষান-কিষানির ঘাম ঝরানো উদয়াস্ত খাটুনি, কৃষিবিজ্ঞানীদের প্রশংসনীয় গবেষণা ও অবিশ্বাস্য উপাদান ভর্তুকিসহ সরকারের সংবেদনশীল ও কার্যকর নীতি-কৌশলের ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ম্ভর। তবে এই অসাধারণ অর্জনের মূল প্রচেষ্টা শুরু হয় জাতির জনকের উদ্যোগে স্বাধীনতার উষালগ্নে। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের পটভূমিতে ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের ফলে একাত্তরের ডিসেম্বরে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার মুখ দেখতে পেল। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকরা বাংলার প্রাণ বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারের মৃত্যুকূপ থেকে সসম্মানে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। গৌরবে দীপ্ত স্বাধীনতাসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেই যেসব অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি খাত পুনর্গঠন ও উন্নয়ন।

জনমানুষের কল্যাণ কামনায় সদা নিবেদিতপ্রাণ বঙ্গবন্ধু বাংলার কৃষকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। রাজনীতির প্রয়োজনে গ্রামবাংলার আনাচকানাচে বহুবার ঘুরে ফিরেছেন শেখ মুজিব। পেয়েছেন কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম প্রীতি, হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। এই উভয় দিকের পারস্পরিক ভালোবাসার নিখাদ ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বকে আজীবন মনে রেখেছেন জাতির জনক। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ৮৫ শতাংশ মানুষ গ্রামবাংলায় বাস করত। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আহরণ করা হতো কৃষি খাত থেকে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অমানুষিক পরিশ্রম করে কৃষক ভাই-বোনেরা বাংলাদেশের সব শ্রেণির মানুষের অন্ন জোগান দিচ্ছে—সে কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করতেন জাতির জনক। তিনি জানতেন বাংলার সোনালি আঁশ পাটের উৎপাদনে কী কঠিন পরিশ্রমই না করতে হয় চাষি ভাইদের। দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র মরণপণ মুক্তিযুদ্ধকালে পল্লী এলাকার কৃষক ও মা-বোনেরা সস্নেহ সমর্থন, নিরাপদ আশ্রয় ও লুকিয়ে খাবার জোগান দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজকে অনেকখানি এগিয়ে দেয়—এসব বিষয়েও তিনি অবগত ছিলেন। দখলদার বাহিনীর ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের মুখে সামনে মুক্তিবাহিনী ও পেছনে মুক্তিকামী কৃষককুল ও সব শ্রেণির বৈরী মানুষের অবস্থান হানাদার বাহিনীর ওপর যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে তা দেশকে পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত করতে কার্যকরভাবে সহায়তা করে, তা-ও বঙ্গবন্ধু অবহিত ছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর গ্রামপর্যায়ে ২২ লাখেরও বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করতে হবে—সেই লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার দৃঢ়সংকল্প কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে। জাতির জনকের সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়, নেতৃত্ব ও নির্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সদ্য স্বাধীন কৃষি ও কৃষকের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে :

১. ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করা;

২. কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, দুই হাজার ৯০০ গভীর নলকূপ ও তিন হাজারটি অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়;

৩. ১৯৭২ সালের মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে বিনা মূল্যে ও কয়েকটি ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ১৬ হাজার ১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাটবীজ ও এক হাজার ৩৭ টন গমবীজ সরবরাহ করা হয়;

৪. দখলদার পাকিস্তানি শাসনকালে রুজু করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষক ভাইদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাদের সব বকেয়া ঋণ সুদসহ মাফ করা হয়;

৫. ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা রহিত করা হয়;

৬. ধান, পাট, তামাক, আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে মূল্য সমর্থনদানকারী ন্যূনতম ন্যায্য মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়;

৭. গরিব কৃষকদের বাঁচানোর স্বার্থে সুবিধাজনক নিম্নমূল্যের রেশন সুবিধা তাদের আয়ত্তে নিয়ে আসা হয়

এবং

৮. গরিব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে ও সরকারি খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এ ছাড়া মধ্যবর্তী মেয়াদের জন্য দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোগত পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে মুজিব সরকারের প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য নিবারণের তাগিদে কৃষি উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। আরো কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলেও বঙ্গবন্ধু যে কৃষি ও কৃষকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনায় নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই সময় দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল ৩৫ শতাংশ। ইতিমধ্যে বিরাজমান খাসজমির সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বঙ্গবন্ধু পরিবারপিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে দেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের খাদ্য ঘাটতি ছিল প্রাথমিক হিসাবে ৩০ লাখ টন বা ৩০-৩৫ শতাংশ। তাৎক্ষণিকভাবে আমদানির মাধ্যমে ও স্বল্প মেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে এবং কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাসজমি বিতরণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করা হয়। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টনের ফর্মুলা নির্ধারণে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত জোরদার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন। এর ফলে ভাটির দেশ হিসেবে গঙ্গার পানির ৪৪ হাজার কিউসেক হিস্যা পাওয়ার যে সম্মতি তিনি আদায় করেন, পরবর্তী কোনো সরকারই সে লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছেও যেতে পারেনি। ১৯৬৮-৬৯ সালের ১১ হাজার শক্তিচালিত পাম্পের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ হাজারে। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লাখ একরে উন্নীত হয়। বিশ্ববাজারে রাসায়নিক সারের মূল্যবৃদ্ধির অভিশাপ থেকে বাংলার কৃষককে ভর্তুকি দিয়ে রক্ষা করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের মণপ্রতি ভর্তুকি মূল্য ধার্য করা হয় যথাক্রমে ২০ টাকা, ১৫ টাকা ও ১০ টাকা। গঙ্গা নদীর প্রবাহ থেকে অধিক পানি প্রাপ্তি, সেচব্যবস্থার প্রসার, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, অতিরিক্ত খাসজমি প্রাপ্তি ও মূল্য সমর্থনমূলক সচেতন ও কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তিনটি বিরতি ছাড়া তারই ধারাবাহিকতায় আজ কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭২ সালে দেশের খাদ্য উৎপাদন ছিল এক কোটি টন। ইতিমধ্যে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে ১৫ শতাংশ। আর ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চার কোটি ৮০ লাখ টন।

জাতির জনক তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও চাষি ভাইদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মেলামেশার ফলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কৃষি খাতে আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। গণচীনে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে ত্রিশের দশকে কৃষিক্ষেত্রে কালেক্টিভাইজেশনের জাঁতাকলে লাখ লাখ লোকের প্রাণহানির ঘটনায় তিনি খুবই আতঙ্কিত ছিলেন। তাই রক্তাক্ত স্বাধীনতার উষালগ্নে খাদ্যাভাবে মৃত্যুর ঘটনা রোধে তিনি সর্বাত্মক ও সফল উদ্যোগ নেন। স্বল্পমেয়াদি এই জরুরি কর্মকাণ্ডের পর মধ্যমেয়াদি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোটামুটি অগ্রগতি, উন্নয়ন ও স্থিতি আনয়নের চেষ্টা করা হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধু সরকার হাত দেয় দীর্ঘমেয়াদি যুগান্তকারী পদক্ষেপের কাজে। কৃষি বিপ্লব ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রমধর্মী সংস্কার আনার মাধ্যমে গ্রামবাংলার আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা শুরু করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থায়। নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি। গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। এই কো-অপারেটিভে জমির মালিকের জমি থাকবে। বেকার অথচ কর্মক্ষম প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের হাতে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের আওতাধীনে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না।

আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। থানায় থানায় একটি করে কাউন্সিল হবে। আর মহকুমা থাকবে না। প্রতিটি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হবে। নতুন জেলায় একটি করে প্রশাসনিক কাউন্সিল থাকবে। তার একজন চেয়ারম্যান থাকবে। সব কর্মচারী তার মধ্যে থাকবে। এর মধ্যে পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন থাকবে।'

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের দালিলিক মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে একীভূত করে আধুনিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক চাষাবাদে কৃষি উৎপাদন পাঁচ গুণ বেড়ে যেতে পারে বলে হিসাব করা হয়েছিল।

ওপরের রূপরেখা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে কৃষকের বন্ধু জাতির জনক স্থায়ী ভিত্তিতে জমির মালিক ও শ্রমজীবী মানুষের সমন্বয়ে বহুমুখী ও উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি গঠন করে কৃষি উৎপাদনে দুর্বার গতি আনতে চেয়েছিলেন। আর নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যেন এতে কৃষি শ্রমিকের ন্যায্য অংশ থাকে। সরকারি কোষের জন্যও একটি অংশ বরাদ্দ থাকে, যা থেকে জনহিতকর কার্যকলাপে অর্থায়ন করা সম্ভব হতে পারত। থানা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও ইউনিয়নের কাঠামোও তাঁর চিন্তাচেতনায় সুস্পষ্ট ছিল। অনেকে মনে করেন, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও ৬৫ হাজার গ্রামীণ বহুমুখী সমবায় সমিতি, বাংলার কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক বণ্টনের ন্যায়বিচারের যে নিশ্চয়তা শেখ মুজিব আনতে চেয়েছিলেন তার সফলতার সম্ভাবনায় ভীত হয়েই শোষক শ্রেণি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে নির্মমভাবে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও বঙ্গবন্ধুকন্যার সাহসী নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সফল সরকার কৃষিক্ষেত্রে আরো মৌলিক সংস্কার এনে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন সমবায় গঠন করে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজটিকে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারে। বিগত সময়কালে স্বঘোষিত দাতা-মুরব্বিদের তীব্র বিরোধিতার মুখেও কৃষি উপকরণে ভর্তুকির ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে যথাস্থানে ভর্তুকি মূল্যে যথাসময়ে সারসহ অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে কৃষি খাতে যে রেকর্ড পরিমাণ প্রবৃদ্ধির সূচনা করেছে শেখ হাসিনার সরকার, তাতে আশান্বিত হওয়ার কারণ রয়েছে বৈকি। তবে আমলাতান্ত্রিক ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে যেন ইতিমধ্যে অর্জিত সুফল নষ্ট না হয়ে যায় ও বিশেষ করে মূল্যসমর্থননীতি যেন শক্তিশালী ও সময়োপযোগী হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মূল্যসমর্থননীতি বিগত বছরগুলোতে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়েছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া কৃষিজাত পণ্যনির্ভর লাখ লাখ অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র (স্মল) ও মাঝারি (মিডিয়াম) উদ্যোগ (এন্টারপ্রাইজ) কৌশল এমএসএমই এন্টারপ্রাইজ স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা যেতে পারে। এর ফলে কর্মসংস্থান তথা শিল্পায়নে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণে একদিকে যেমন দারিদ্র্য নিরসনে আরো শক্তি সৃষ্টি করা যাবে, অন্যদিকে তেমনি গত সাত বছরে সংঘটিত প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিনন্দন ধারাকে তার স্বাভাবিক পরিণতি—দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অশিক্ষা, অপুষ্টি ও আশ্রয়হীনতার 'ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা'র পরিবর্তে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রযুক্তিনির্ভর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন সফল করা যাবে।

আজকের তরুণ প্রজন্ম কি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কল্যাণ রাষ্ট্রের কাঠামোতে কৃষক ও কৃষিক্ষেত্রে যেসব বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা অনুধাবন করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে!

লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর